## তৃতীয় অধ্যায়

## রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে বিজ্ঞান ভাবনা

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বুদ্ধিপ্রধান ও তাতে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য দেখা যায়। "It speaks directly to the readers, giving the authors views on customs or happenings or people, on art, on books or on life in general. It may teach, argue, persuade, arouse emotion, or merely amuse."[১] ''বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির প্রাধান্যে, চিন্তাঋদ্ধ মননশীলতায়, তথ্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শক্তিকে এইসব রচনায় জ্ঞান–বিজ্ঞান–মনীষার শিল্প গুণান্বিত পরিচয়।''[২] বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ইতিহাসে দেখা যায়, ...''অক্ষয় কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইংরাজী eassy–র আদর্শে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রাকারে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন।''[৩] তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাত ধরে ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। ''তাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূত এক অতি অসাধারণ সাধারণ-বুদ্ধি-ইংরেজিতে যাকে বল'বো most uncommon common-sense - বা সুবুদ্ধির জ্যোতি।''[৪]

বিজ্ঞানবিদ্ রাজশেখর বসুর কিছু প্রবন্ধকে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি – ১) ডাক্তারি ও কবিরাজি (১৯২৩)

২) অপবিজ্ঞান (১৯২৯)

৩) ঘনীকৃত তৈল (১৯৩০)

৪) ইহকাল পরকাল (১৯৪৮)

৫) বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি (১৯৫১)

৬) জন্মশাসন ও প্রজাপালন (১৯৫৩)

৭) বিজ্ঞানের বিভীষিকা (১৯৫৫)

৮) আমিষ নিরামিষ (১৯৫৭)

৯) স্নেহদ্রব্য (১৯৫৯)

## ডাক্তারি ও কবিরাজি (১৯২৩)

লেখক প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছেন, তিনি চিকিৎসক না হলে ও বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন – অনেকের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁকেই মত স্থির করে দিতে হয়। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপাথি কবিরাজি হাকিমি পেটেন্ট স্বস্ত্যয়ন, মাদুলি ইত্যাদি ভিন্ন–ভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আছে।

মানুষ অবস্থাবিশেষে আপন বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার স্মরণ নেয়। ডাক্তারি (আলোপাথি) হোমিওপাথি ও কবিরাজি পদ্ধতির কথা বিশেষ করে প্রাবন্ধিকের মনে পড়ে।

লেখকের মতে, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু সকলের সামর্থ্য সমান নয় তাই সরকার বা জনসাধারণের অনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয়। যদি রাজমত ও জনমত ভিন্ন পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয় এবং জনচিকিৎসার সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান গড়া সহজ হবে না। ‘‘অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়।’’[৫]

দেশের কর্তা ইংরেজ তাই বিলাতের চিকিৎসাপদ্ধতি সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। তবে কবিরাজি চিকিৎসায় সরকারী সাহায্যের জন্য আন্দোলন চলছে। হোমিওপাথি চিকিৎসা হয়ত অল্প ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ার জন্য এর পক্ষে কোন আন্দোলন হয় নাই। লেখক এই প্রবন্ধে সাধারণ ডাক্তারি ও কবিরাজি – দুই পদ্ধতির সরকারী সাহায্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সে সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন।

সরকারী সাহায্য অর্থাৎ সাধারণের অর্থ, অতএব সর্বসাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য প্রাবন্ধিক বলেছেন অর্থ ও উদ্যম যোগ্যস্থানে ব্যবহৃত হয় কি না তা দেখা সকলের উচিত।

প্রাচ্য পদ্ধতির বিরোধীরা বলেন – এই শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। প্রাচীন ঋষিরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন আজও অন্ধভাবে তা মেনে চলা হচ্ছে। কবিরাজি চিকিৎসকরা আধুনিক শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, রাসায়ণ, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই এই পদ্ধতিকে সাহায্য করলে কুসংস্কার ও গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ডাক্তারিতে যদি পূর্বসংস্কার ভুল হয় তবে নতুন তত্ত্বকে সহজে স্বীকার করা হয়। পরীক্ষা করে নব–নব ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করা হয়। – কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতা তার মধ্যে নেই।

প্রাচ্য পদ্ধতির সমর্থকরা বলেন – তোমাদের না হয় আমরা জানি না কিন্তু বিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমরা কি জান। পুরাতন ঋষির পদ্ধতি মানলে ও সেটা মন্দের ভাল নয় কি। তাছাড়া তোমাদের পদ্ধতিতে অনেক খরচ তোমাদের হাতুড়ে ডাক্তার তৈরীতে যা খরচ তা থেকে অনেক কম খরচে আমাদের ভাল কবিরাজ তৈরী হয়। ডাক্তারি ঔষধ পথ্য সবই মহার্ঘ, তাই দেশের সরকারের আর্থিক নীতির উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের অজুহাতে বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা দেখা যায়। আমাদের ঔষধপথ্য সস্তা, গরীবের উপযোগী।

তোমাদের ঔষধে কোহল আছে তা বিলাতী উদরে সহজপাচ্য হলেও এদেশে জঠরে তা অগ্রাহ্য। বড় রোগীকে কবিরাজীও সারাতে পারে। বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকের কাছেও এর সম্মান আছে। তাই বরাদ্দ টাকার কিছু ডাক্তার ও কবিরাজী দুইপক্ষের মধ্যে ভাগ করে দিলেই ভাল হবে।

লেখকের মতে এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসাপদ্ধতি'। 'বিজ্ঞান' শব্দে যদি পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান বুঝায় তবে তা সকল দেশেই সমান।

প্রাবন্ধিক বলেছেন বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়, আমরা সকলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করি। অগ্নিপক্ক দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় তাই খাদ্য রন্ধন করা হয়, দেহ আবরণে শীত নিবারণ করা যায় তাই আমরা বস্ত্র পরিধান করি। তবে সবগুলিতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সবিশেষ জানি তা নয়। কতগুলি সংস্কারবশে, কিছু বা দেখে শুনে শিখি। বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য হল বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক।

চরক বলেছেন –

সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।

সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্।।[৬]

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞানজনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গড়িতে চাকা লাগালে তাড়াতাড়ি চলে এই সিদ্ধান্ত সকল দেশ বিনা র্তকে মেনে নিয়েছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে তা পাশ্চাত্য দেশের আবিষ্কার হলেও সব দেশ মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্ত যে দেশেই হোক না কেন এতে জাতিদোষ থাকতে পারে না।

প্রাবন্ধিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন –

১) পরীক্ষা সাধ্য এবং বার–বার হয়েছে।

২) যার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় নি বা অসম্ভব, কিন্তু যা অনুমানসিদ্ধ এবং যার সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন দেখা যায় নি।

চিকিৎসা ব্যবহারিক বিদ্যা, প্রাচ্য প্রতীচ্য – যে কোন শ্রেণীর চিকিৎসক যখন সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে অগ্রসর হবেন তখনই সত্যিকার সুফল লাভ করা যাবে। নবলব্ধ জ্ঞান এবং প্রাচীন পন্থা – এই দুইয়ের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল মন্দ অবশ্যই দেখা যাবে। লেখক চরকের বাক্য উল্লেখ করেছেন –

''ন চৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারম্।''[৭] – আয়ুর্বেদের শেষ নেই।

বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশ কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল। বিলাতের লোক টেবিলে চীনামাটির বাসন ও কাচের গ্লাসে রুটি মদ মাংস খায়। আমরা ভূমিতে বসে কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে খাই, উদ্দেশ্য এক পদ্ধতি ভিন্ন। ভাল মন্দ একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখি। প্রাবন্ধিক বলেছেন দুষ্ট প্রথা শিখে ভুল করেছি, ''কিন্তু যদি নির্বিচারে ভাল মন্দ সকল বিদেশী প্রথাই বর্জন করিতাম তবে আরও বেশী ভুল করিতাম।''[৮]

চাকা–সংযুক্ত গাড়ি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনী লোক ও রাস্তা ভাল হলে মোটরে যাতায়াত করতে পারে কিন্তু পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে গোযান অধিক উপযোগী। তাই বলা যায় ''উদ্দেশ্যসিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে এবং অবস্থাবিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞজনের গ্রহনীয়''।[৯]

পরিবর্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে কবিরাজী ও ডাক্তারি উভয়

পদ্ধতি দোষী। ডাক্তারী পদ্ধতিতে বিলাতের ঔষধ ও পথ্য এবং বিলাতী রীতিতে প্রস্তুত এবং বিলাতের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাস রুচি অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হলেও আধেয় থেকে আধারের খরচ বেশী। দেশসুদ্ধ লোকের সুব্যবস্থার কথা সরকারী ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে না।

একদল পুরাতনকে আকড়ে বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করছেন অপরদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞান ও বিলাসিতার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। লেখক ডাক্তারি ও কবিরাজি সম্বন্ধে বলছেন – ''আমাদের কবিরাজ ও ডাক্তারগণ যদি নিজ নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন তবে ক্রমশ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এদেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্বেদের উদ্ভব হইতে পারে''।[১০]

লেখক তাঁর মতামত দিয়েছেন প্রাচ্য প্রতীচ্য পক্ষপাত বর্জন করে উভয় পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত বিধান ও চিকিৎসায় যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্বাচন করতে হবে। চিকিৎসার উৎকর্ষ কম হলেও চলবে, তবে চিকিৎসারউপায় বহুপ্রসারিত, সাধারণ মানুষের সাধ্য ও সুদূর পল্লীতে প্রসারিত হতে হবে। কম মূল্যে ঔষধ তৈরী করার ব্যবস্থা করে, যে সব লোকের ভাগ্যে সামান্যতম চিকিৎসা জুটে না তাদের জন্য সামান্য হলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

অর্থ ও উদ্যমের সৎ প্রয়োগ করার জন্য সরকারী সাহায্যে এই প্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ করা উচিত –

১) ডাক্তারি স্কুল–কলেজ পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদকে স্থান দেওয়া।

২) সাধারণের চেষ্টায় যে সকল আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা, সাহায্যের শর্ত এই হওয়া উচিত যে চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞান সকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩) বিলাতী ফার্মাকোপিয়ার অনুরূপ এ দেশের উপযোগী সাধারণ প্রযোজ্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকলন। এদেশের ফার্মাকোপিয়া বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ তৈয়ারির যেসকল ডাক্তারি প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালী ও থাকা উচিত।

৪) দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ। যে সকল নূতন চিকিৎসক আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয় যে, জ্ঞান সর্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য অভ্যাস ও রুচি অনুসারে করিব, তবেই উপরের উদ্দেশ্য সহজ হবে।

১৯২৩ সাল অর্থাৎ পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসার ঠিকমত ব্যবস্থা করার মানসিকতা এই প্রবন্ধের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রোগ থেকে আরোগ্যলাভের উপায় ভিন্ন – কবচ তাবিজ, ডাক্তারি, কাবিরাজী ইত্যাদি তারমধ্যে প্রধান হল – অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপাথি, কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতি।

এই ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে লেখক সরকারী সাহায্যের জন্য অ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ভারতীয় পদ্ধতি যদিও কবিরাজী কিন্তু অ্যালোপ্যাথি ও বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যে প্রযোজ্য। তাই পাশ্চাত্য পদ্ধতি ভেবে একে দূরে না ফেলে সকল কিছু থেকে ভাল বস্তু সন্ধান করার জন্য লেখক পরামর্শ দিয়েছেন। নিত্যদিনের জীবন

সমস্যার একটি উপাদানকে গ্রহণ করে তার মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি পরম্পরা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে লেখকের জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সেগুলি প্রকাশের যথোপোযুক্ত ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ''প্রত্যেক বিষয়ের প্রবন্ধেই স্বচ্ছ চিন্তা, প্রায় অকাট্য যুক্তি, পরিমিত প্রকাশ ভঙ্গি এবং চিন্তা করার মত প্রস্তাব অবাক করে দেয়।''[১১]

স্বাস্থ্য পরিষেবায় আম–জনতাকে সংকলিত করে গ্রাম জীবন পর্যন্ত সুযোগ পৌঁছানোর সহজলভ্য স্বল্পব্যায়ী যে পন্থা আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাম্য তারই পূর্বাভাস সুচিন্তিতভাবে পেশ করেছেন রাজশেখর বসু তাঁর প্রবন্ধের অনুপঙ্খ বিশ্লেষণে।

## 'অপবিজ্ঞান' (১৯২৯)

প্রাবন্ধিক বলেছেন পরাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে অন্ধসংস্কার যদিও দূর হচ্ছে কিন্তু আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ধর্মের বুলি নিয়ে যেমন অপধর্ম তেমনি বিজ্ঞানের শব্দ নিয়ে অপবিজ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ লেখক প্রথমে উল্লেখ করেছেন – 'বিদ্যুৎ' প্রসঙ্গক্রমে লেখক একটি গল্প বলেছেন. 'এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু থেকে বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হয়ে সমুদ্রের জল এক নিমেষে হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার পত্রিকায় কবিরাজ মহাশয় লিখছেন – ''সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসী গাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।''[১২] তেমনি বৈদ্যুতিক সালসা, আংটি, অষ্টধাতুর মাদুলি, বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধ প্রভৃতির কথাও শোনা যায়। তাছাড়া বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, কারো মতে বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে তাই মালী বাতের জন্য টেলিগ্রাফের তার দিয়ে হাতে তাগা পড়েছিল ।

লেখক বলেছেন, উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই – শাস্ত্রের এই বিষয়কে মানতে বিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে। ''পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহ নাকি চুম্বকধর্মী – অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ।''[১৩] কিন্তু দক্ষিমেরু নিরাপদ হওয়ার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই।

প্রবাদ আছে, জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধূঁয়া বের হয় তা বিষ। অপবিজ্ঞানের মতে, জোনাকির আলোকে ফসফরস আছে এবং এই ধূঁয়া মারাত্মক । বিজ্ঞানের কথা হল, ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তা থেকে আলো বের হয় এবং ফসফরস বিষও বটে, তবে জোনাকির আলো ফসফরস – জনিত নয়। প্রাণীদেহে অল্প পরিমাণে ফসফরস যৌগিক অবস্থায় থাকে এবং তা বিষ নয়। একটুকরা মাছে যত ফসফরাস আছে জোনাকিতে তা থেকে অনেক কম ফসফরাস থাকে, তাই মাছ পোড়া ও জোনাকি পোড়া সমান নিরাপদ।

বৈজ্ঞানিক কোন–কোন নাম বা শব্দ মানুষ অস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। 'গাটাপার্চা' হল রবারের মত বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ – এটি দিয়ে প্রধাণতঃ বৈদ্যুতিক তারের আবরণ, জলরোধক বার্ণিশ, ডাক্তারি চিকিৎসায় এর পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ফাউন্টেন পেন, চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে মানুষ 'পাটাপার্চা' বলে থাকে।

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি থেকে সেলিউলয়েড হয়। সেলিউলয়েড থেকে ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি প্রভৃতি শৌখিন জিনিস এই পদার্থ থেকে তৈরী হয়।

রবারের সঙ্গে গন্ধক মিলিয়ে ইবনাইট বা ভল্কানাইট প্রস্তুত হয় – এটি দিয়ে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বাংলায় ভল্কানাইট কে 'কাচকড়া' বলে একথার মূল অর্থ

কাছিমের খোলা।

বঙ্গভঙ্গের সময় মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করে স্বদেশী চুড়ি ব্যবহার করেছিল। যা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা দিয়ে প্রস্তুত হত যার নাম ছিল আলুর চুড়ি, যার সঙ্গে আলুর কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি 'আলপাকা শাড়ি' আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়, কিন্তু 'আলপাকা শাড়িতে' পশমের লেশমাত্র ছিল না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন মনোবিজ্ঞানের উপর মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই Psychological moment কথাটি কিছুদিন সংবাদপত্র ও বক্তৃতায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে Complex কথাটি ব্যবহার করা হয় যেমন, অমুক লোক ভীরু বা অনুগত, অতএব তার inferiority complex সাঁতার দিতে যারা বেশী পছন্দ করে তাদের সম্বন্ধে বলা হত water complex ।

মানব কৌতুহল প্রিয়, সবকিছুতে তার প্রমাণের প্রয়োজন এতে আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই যে প্রমাদকে প্রমাণ করে এবং বাক্‌ছলকে হেতু ভাবে। বাংলা মাসিক পত্রিকার জিজ্ঞাসা বিভাগের লেখকগণ অপবিজ্ঞানের হাস্যকর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যেমন – বাতাস করতে গায়ে পাখা ঠেকলে তা মাটিতে ঠুকতে হয় – এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। তেমনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় একজন প্রশ্ন করেছিল মাছির মল থেকে পুদিনা জন্মায় তা সত্য কি না, এ নিয়ে পত্রিকায় নানা বাক–বিতণ্ডার পর সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশ চন্দ্রের মত প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন যে পুদিনা জন্মায় না।

তেমনি অপর প্রশ্ন কর্পর উবে যায় কেন, উত্তর উদ্বায়ী তাই উবে যায়, তবে উদ্বায়ী কথার মানে হল, যা উবে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী কখন এইভাবে কোন বিষয় সম্বন্ধে ভালভাবে না জেনে উত্তর দিতেন না।

প্রাবন্ধিকের মতে বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বের করা। কিন্তু কোন বিষয়ের সকল যোগসূত্র বিজ্ঞান নির্দিষ্ট করে দিতে পারে না। যেমন নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন - জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation. সেজন্য নিউটন যে সূত্র দিয়েছিলেন তা হল, 'Law of Gravitation' কিন্তু আকর্ষণের হেতু এখানে বিশ্লেষণ করা হয় নি। মানুষ মরণশীল কারণ তা সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়। এই কারণগুলি নির্দেশের জন্য মানুষ অপবিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়। অপবিজ্ঞানের আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে বেশী জ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যদিও প্রশ্নগুলির সঠিক কোন উত্তর নির্দেশিত হয় না।

মানুষ যেগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেছে তা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয় laws are not causes যা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তা দার্শনিকরা প্রতিনিয়ত সন্ধান করে চলেছেন।

প্রাবন্ধিক প্রসঙ্গক্রমে অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদের কথা বলেছেন। এটি ভারতীয় বস্তু, কিন্তু সাধারণ লোক যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় নেয় তাকে অপবিজ্ঞান বলা হয়।

বহুযুগের অভিজ্ঞতায় মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক দূরদৃষ্টি জন্মেছে। জাগতিক ব্যাপার – 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়, দৃষ্টতে আমাদের হাত আছে অদৃষ্টে হাত নেই।

নিয়তিবাদী দার্শনিকের মতে, জগতে যা ঘটে যায় সমস্তই নিয়তি – মানুষের সাধ্য আসাধ্য সবই নিয়তি তবে চেষ্টা বিফল হলেই ''এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত।''[১৪]

বিজ্ঞানীর মতে --- ''বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব।''[১৫] তাই, অদৃষ্ট মানে অনির্ণেয় বা অসাধ্য ঘটনাসমূহ নিয়তির অর্থ – সমস্ত ঘটনা অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা অনুপূর্ব। লোকটি মরিল কেন, উত্তর হল – কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স – এগুলি যদিও কারণরূপে দেখানো হল কিন্তু মরণের অনির্ণেয়তা বা অনিবার্যতাই মরিবার কারণ অথচ অদৃষ্ট অর্থাৎ তাই। যে অবিসংবাদিত সত্য বা Truism সেকথা শুনেও মানুষের কৌতুহল কমে না বা সান্ত্বনা পায় না – তাই 'নিয়তি'। অদৃষ্ট ও নিয়তি দুটি শব্দ প্রকৃত অর্থ হারিয়ে বর্তমানে বিধাতার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে আমরা সুখ–দুঃখের নিগূঢ় কারণরূপে নির্দেশ করছি। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিক অধ্যাপক Poyinting এর উক্তি তুলে ধরেছেন – "No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficeient in themselves to govern the universe. ---- A law of nature explains nothing - it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified."[১৬]

বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে মানুষ ঠিক অবগত নয় তথাপি অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়ে সমাজে চলনশীল করে দিয়েছে – একেই বলে অপবিজ্ঞান। বিজ্ঞান রসায়ণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে একবার হওয়া কোন বিষয় যা শুধু একবার প্রমাণেই স্থির নির্দিষ্ট করা হয় না, বিভিন্ন জন এই পরীক্ষা করে একই সত্যে পৌঁছাতে পারেন তবেই সেটি বিজ্ঞানের বিষয়। বাস্তব সংসারে প্রচলিত নানা সংস্কার রীতি–নীতি সমস্ত কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যেখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সেখানেই

বোধহয় অপবিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসর।

সমাজের সাধারণ মানুষ নিজের কথাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলির প্রয়োগ তাদের মনগড়া বিষয়ের মধ্যে করে থাকে এবং এরসঙ্গে সত্যিকার বিজ্ঞানের কতটা সামঞ্জস্য আছে তা দেখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না, এমনভাবে এই পরিভাষাগুলি ব্যবহার করা হয় যে সমাজে এই 'মনগড়া' বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে থাকে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তকমা এঁটে অপবিজ্ঞানকে বহুজনগ্রাহ্য করে তোলার প্রবণতা মানুষের স্বতঃসিদ্ধ।

দর্শন ও বিজ্ঞান দুই পৃথক বস্তু আর একদিকে বলা যায় যেখানে বিজ্ঞানের সীমা শেষ সেখান থেকে দর্শনের জগৎ আরম্ভ। লোকবিশ্বাসগত কিছু বিষয় যা অপবিজ্ঞান নামে পরিচিত, সেই দৈনন্দিন ব্যবহার্য কথাকে লেখক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ চিন্তায় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অপবিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য নিরপেক্ষ ও সাবলীল ভাষায় উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন। সমাজ – মানসের সার্বিক চিন্তাকে যুক্তিসিদ্ধভাবে রসবোধ সঞ্চারিত করে লেখক আমাদেরকে সাহিত্যরসে জাড়িত করেছেন।

## ঘনীকৃত তৈল (১৯৩০)

চলিত কথায় তৈল বলতে দাহ্য, অল্পাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য পদার্থ বোঝায়। প্রাবন্ধিক বলেছেন তার্পিন, কেরোসিন ও সর্ষপ তেলের মধ্যে পার্থক্য আছে কারণ তার্পিন সহজে উবে যায়, কেরোসিন উবিতে সময় লাগে, সর্ষপ তৈল মোটেই উবে না।

লেখকের মতে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আমরা স্থূল লক্ষণ দেখে শ্রেণীবিভাগ করি। বিজ্ঞানী কোন লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক

তা দেখে শ্রেণীবিভাগ করেন। উদাহরণ – সাধারণ মানুষ চিংড়ি মাছ বলে বিজ্ঞানী বলেন চিংড়ি মাছ নয়। কবি বলেন – তাল তমাল, বিজ্ঞানী বলেন – এই দুই গাছে অনেক পার্থক্য।

রাসায়ণশাস্ত্র মতে তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈল তিনটি পৃথক শ্রেণীর –

১) গন্ধতৈল – তার্পিন, চন্দন, নেবুর তেল।

২) বার্মা–বাতি – কেরোসিন, পেট্রল, ভ্যাসেলিন কঠিন প্যারাফিন।

৩) স্নেহদ্রব্য বা Fat (উদ্‌ভিজ্জ বা প্রাণীজ) – সর্ষপ তৈল, তিল তেল, ঘৃত, চর্বি।

মানুষের খাদ্যের এক প্রধান উপাদান তৈল, প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন তেলের ব্যবহার দেখা যায় – সর্ষপ তেল, চীনাবাদাম, নারিকেল তেল, কার্পাসবীজের তেল, রেড়ির তেল, ঘৃত তো আছে, আবার চর্বির ভক্ত ও দেখা যায়।

তৈল ও সোডা দিয়ে সাবান উৎপাদন হয়। তৈলভেদে সাবানের গুণের পার্থক্য থাকে – চর্বি ও নারিকেল তেল মিশানো সাবান শক্ত হয়, রেড়ি, চীনাবাদাম, তিল তেলের সাবান নরম। শক্ত সাবান ও অধিক ফেনা হওয়ার জন্য উপযোগী। মিলে কাপড় বানানোর পূর্বে সুতায় যে মাড় দেয় তার প্রধান উপকরণ চর্বি।

''ফরাসী রাসায়নবিৎ, আবিষ্কার করেন যে নিকেল ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায়, তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়''।[১৭] বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কারকে মূলধন করে একটি বিশাল ব্যবসারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে কোন ধরণের তেল এমনকি গন্ধমাছের তেলও হাইড্রোজেনের মাত্রা দিয়ে ঘৃতের মত কোমল, চর্বির মত ঘন এবং মোমের মত কঠিন পদার্থ তৈরী করা হয়। ইওরোপ আমেরিকায় হলাণ্ড ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জারিন, মারগারিন, চকোলেট, টফি, বিস্কুট প্রভৃতিতে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ইওরোপ আমেরিকায় এই ব্যবসা আবদ্ধ ছিল বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ভারতবর্ষের বাজার লক্ষ্য করে তৈরী করলেন – 'Vegetable Product' বা 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ' এবং পবিত্রতার নিদর্শনরূপ মার্কা দেওয়া হল – বনস্পতি, পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল, হোটেলওয়ালা, দরিদ্র গৃহবধূ, ভোজের রন্ধনশালায় এমনকি দরিদ্র গোয়ালা ঘি এ ভেজাল মিলাতে এই দ্রব্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

কলিকাতা করপোরেশন ও প্রাদেশিক কাউনসিলে ঘনীকৃত তৈলের সপক্ষেও বিপক্ষে অনেক যুক্তি তুলে ধরেছেন –

সপক্ষে -

১) সকলের ঘি খাওয়ার সঙ্গতি নেই।

২) কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে যা ঘনীকৃত তৈলে সুস্বাদু হয় – কচুরি, গজা, মিঠাই, চপ।

৩) কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধও নেই, এতে খাবার ভাজলে ঘি–এর ভাজা বলে ভ্রম হয়।

৪) ঘি–এর উপর ভারতবাসীর যে প্রবল আসক্তি তা নির্গন্ধ ঘনীকৃত তেলে কিছুটা মিটিবে।

৫) দূষিত চর্বিময় ভেজাল ঘি থেকে নির্দোষ ঘনীকৃত তেলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা পাবে। ঘৃতের গন্ধ চাইলে এর সঙ্গে কিছুটা বিশুদ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করে দিতে পারা যায়।

বিপক্ষে -

১) ঘি–এর ভেজাল বৃদ্ধি পেয়েছে।

২) অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনছে।

৩) ঘৃতে ভাইটামিন আছে ঘনীকৃত তেলে নেই তাই ঘনীকৃত তেলের চলন বাড়লে স্বাস্থ্য হানি হবে।

৪) সস্তা মাছের তেলে প্রস্তুত কি না এ নিয়ে সন্দেহ।

৫) রাসায়নিকদের মতে ঘনীকৃত তেলে ঈষৎ মাত্রায় নিকেল বা ধাতু দ্রবীভূত থাকে তাতে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

প্রাবন্ধিক বিদেশী ঘনীকৃত তেলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখিয়েছেন – এতে ধর্মহানি হয়, এই ধর্ম – ''দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম''[১৮] পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজদের উৎপাদিত দ্রব্যে ভারতবাসী বেঁচে থাকবে, এটা ভারতের অপমানের বিষয় তাই রাজশেখর বসু স্বদেশী তেল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতের উৎপাদিত তেলের প্রচারের জন্য লেখক আমাদের কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন –

১) মিউনিসিপ্যালিটির চেষ্টায় তিল তেলের প্রচার সহজে হবে।

২) চুনিলাল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুন্দরী মোহন দাস, রমেশ চন্দ্র রায় প্রভৃতিদের রচিত প্রবন্ধ জনসাধারণেকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করতে পারবে।

৩) ময়রা যেন প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তেলের ও ঘৃতমিশ্রিত তেলের খাবার বিক্রি করার ব্যবস্থা রাখে।

৪) ঘি খাইব না পেলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তেল বা ঘৃতমিশ্রিত তেল খাব লোকের এই মানসিকতা রাখতে হবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় লোকের উদ্‌যোগে ঘনীকৃত তেলের উৎপাদন করলে ধর্মহানির হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। ''কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পুতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।''[১৯]

ঘনীকৃত তৈল কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক তেলের ধর্ম শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন তেলের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীর মাননসিকতার পার্থক্য

পরিস্ফুট করেছেন – 'লোকে কয়েক প্রকার লবণ জানে ''বিজ্ঞানী বলেন, – – – লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ।''[২০]

তৈল মানুষের খাদ্যের এক প্রধান উপাদান। অতি সাধারণ নিত্য দিনের ব্যবহার্য্য এই বস্তুটিকে বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিতে দেখে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। তেল এবং সাবান উৎপাদনের মূল কথা বলেন দক্ষ ব্যবসা পরিচালক রাজশেখর বসুর ব্যবসায়িক মনোভাব প্রকাশিত হয় – ''তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্বি ও নারকেল তেলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম।''[২১]

বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লিখলেও অনাড়ম্বর ভাষা আমাদের মনকে এক বিশেষ সাহিত্য রস দান করে, যাতে আমরা মুগ্ধ হই। তুচ্ছ স্বদেশীয়ানার নামে তথাকথিত দেশজ ভাবনায় অনড় না থেকে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি রাজশেখর বসুর কৌতুকস্নিগ্ধ যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়ের অবতারণা করে প্রবন্ধে সুস্থ চিন্তাস্রোত নিয়ে এসেছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কৌতুকের মুচকি হাসিটিও 'পুতনা' – কাহিনীর পৌরাণিক্ উপস্থাপনায়।

## ইহকাল পরকাল ( ১৯৪৮)

স্বাধীণতার পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

প্রথমে প্রাবন্ধিক একটি ইংরেজী প্রবাদ উল্লেখ করে দার্শনিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি তুলে ধরছেন – অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ একটি কালো বেড়ালকে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু বেড়াল সেই ঘরেই নেই, একেই বলে দার্শনিক গবেষণা। বৈজ্ঞানিক মত প্রায় সর্বসম্মত, প্রথম একটি সিদ্ধান্ত দাঁড়ালেও পরবর্তীকালে যদি ব্যাপক ও যুক্তি সম্মত মত স্থির হয় তবে পূর্বের মত সবাই ছেড়ে দেন। পূর্বে ছিল পৃথিবী স্থির, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং

সেই হিসেবে জ্যেতিষ গণনাও হতো। পরে দেখা গেল সূর্য স্থির পৃথিবী বা গ্রহ তাকে আবর্তন করছে এবং এই সিদ্ধান্তে জ্যোতিষগণনা সরল হয় – সব বিজ্ঞানীই এই মত মেনে দিলেন। নিউটনের মহাকর্ষবাদের পর আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত যদিও স্থূল গণনায় নিউটনের সূত্রেই কাজ চলে।

প্রাবন্ধিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বের পার্থক্য এই অংশে তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানের তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত, অবিস্কর্তাদের নাম প্রচার নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। দার্শনিক পাঠ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকে না তবে শংকর, রামানুজ, স্পিনোজা, হিউম, বার্কলি হেগেল প্রভৃতি আলোচনা পাঠককে দিশাহারা করে দেয়।

''বিজ্ঞান প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ে কারবার করে, তার সহায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তদাশ্রিত অনুমান, কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কি না তা বারবার পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর স্থির করা হয়।''[২২] গীতায় আছে, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নব বস্ত্র পরে, সেরূপ জীব জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নব শরীর গ্রহণ করে, কিন্তু গীতাকার প্রমাণ দিলেন না। বার্কলি বললেন, ঈশ্বরের চৈতন্যই সকল পদার্থের আধার – কিন্তু উপায় বলে দিলেন না। এক কথায় বলা যায় দার্শনিক মতের প্রমাণ নেই তাই পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়েছে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের মাঝে যে প্রান্তভূমি আছে পণ্ডিতরা তাতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন।

'বোধোদয়ে' বিদ্যাসাগর সমুদায় বস্তুকে পদার্থ বলেছেন। আমরা যেসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথক–পৃথক বিষয়ের সংস্রবে আসি তাদেরকে পদার্থ বলে। গাছ নক্ষত্র পাহাড় নদী বাড়ি ইট শস্যকণা সবই পদার্থ। পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ হয় কিন্তু সবগুলি আমরা অনুভব করতে পারি না। পদার্থ নিরন্তর পরিবর্তনশীল – অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন মন্থর তাই

আমাদের অগোচর।

একদেশসম্বন্ধ – এইটি দার্শনিক সংজ্ঞা। যখন আমরা গাড়ি চড়ি বা বিছানায় শুই তখন সর্বদেহ দিয়ে তা ব্যাপ্ত করে থাকি না। তাই এইগুলির সঙ্গে আমার একদেশসম্বন্ধ। পিতা ও পুত্র যখন একই কালে বিদ্যমান থাকে – এককালসম্বন্ধ। দুজন লোক যদি একই কালে জন্মে এবং একই কালে মরে তবে সমকালসম্বন্ধ হয়। জগতে যত লোক এক কালে জীবিত থাকে তাদের আলাপ পরিচয় না থাকলেও এককালসম্বন্ধ বলা হয়। মহাভারতে, শান্তিপর্বে উদাসীন তত্ত্বদর্শী বলেছেন –

''যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।

সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্‌তদ্‌ভূতসমাগমঃ।।''[২৩]

অর্থাৎ, মহাসমুদ্রে ভাসতে–ভাসতে এক খণ্ড কাষ্ঠ অপর এক কাষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার দূরে চলে যায়, প্রাণিগণের মিলন বিরহ ও সেইরূপ।

প্রাবন্ধিক প্রশ্ন করেছেন, আমাদের মৃত্যুর পর কি পুনর্বার মিলনের সম্ভাবনা নেই ? হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সবাই বলেন, আত্মা মরে না পরজন্মে বা স্বর্গে নরকে মিলন হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী মন ইহকালে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে জানতে চায়। শাস্ত্রে আছে – 'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জান।

লেখক বলেছেন, একটি সমগ্র জীবনই যথার্থ সত্তা। শুধু দেশ কালে ব্যাপ্ত শরীর নয়, চিত্ত কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। একটি লোক যত বছর বেঁচে থাকে সেই সময়ে তার শারীরিক মানসিক পরিবর্তন ও সুখ দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ, সুকর্ম, দুষ্কর্ম সব মিলিয়ে সেই মানুষটির সত্তা। আপাত দৃষ্টিতে হিমালয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গঙ্গার জলরাশি —— সকলগুলির মধ্যে একটি ঘটনা প্রবাহ বা গতি দেখা যায়। গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লাইটাস বলেছিলেন যে এক

নদী দুইবার পার হওয়া যায় না। তেলের বাষ্প এবং বাতাসের অক্সিজেন একসঙ্গে মিশে প্রদীপের শিখা জ্বলছে কারণ এই দুই উপাদান নিরন্তন বদলাচ্ছে।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেতন অবস্থায় যে অহংজ্ঞান থাকে যেমন – করছি, ছিলাম, হয়েছি —— এই ধারাবাহিক জ্ঞান বা স্মৃতিই আমার ব্যক্তিত্ব, তাই আত্মা, মহাভারতের উপমা থেকে বলা যায় —— মহাকাল সমুদ্রে ঘটনা প্রবাহরূপে অনেক কাষ্ঠ থাকে যেগুলি কাছে আসে বা সচেতন তার সঙ্গে আমাদের এককালসম্বন্ধ হয়। যে কাষ্ঠ দূরে চলে যায়, তাই মৃত। মৃত্যুর পরে চেতন বা ব্যক্তিত্ববোধ থাকে কি না বলার সাধ্য প্রাবন্ধিকেরও নেই।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক J.W. Dunne কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন – An Experiment with time, The New Immorrtality. The Serial Universe ইত্যাদি । —— এগুলি গ্রন্থে কাল, সংবিৎ সম্বন্ধে নূতন মত প্রচার করেছেন। অনেক যুক্তি ও অঙ্ক কষে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে আমাদের চেতনা বা সংবিৎ চিরস্থায়ী অর্থাৎ আমরা সকলেই অমর। একসময় এই বইগুলি অনেক গুরুত্ব পেয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের উৎসাহ প্রায় কমে গেল। হয়ত লেখকের নির্দেশিত পথে পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি।

দিব্যদৃষ্টি, ত্রিলোক–ত্রিকাল দর্শিতার কথা পুরাণে আছে। Clairvoyance, Telepathy, medium মাধ্যমে মৃতজনের সঙ্গে আলাপ, ইত্যাদিতে আস্থাবান লোকেরও অভাব নেই। সম্প্রতি আমেরিকায় Rhine এবং ইংলণ্ডে Soal প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করছেন। নানা রকমের চিহ্ন আঁকা কতগুলি কার্ড গবেষণার উপকরণ —— একজন লোককে যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্ডগুলি দেখান হয় এবং দূরবর্তী অন্য ঘরের লোকটি অনুমানে এই কার্ডের বর্ণনা দেয়। এই পরীক্ষা থেকে

সিদ্ধান্ত হয়েছে, কয়েকজন লোকের Telapathy–র ক্ষমতা আছে এবং সকল লোকের ঈষৎ মাত্রায় আছে।

লেখক বলেছেন, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন প্রমাণ করেছিলেন যে বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রে মানুষ কখনও উড়তে পারবে না কিন্তু পরবর্তীকালে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেষণা সবে আরম্ভ হয়েছে তবে ভবিষৎ–এ এর ফলাফল আমাদের সামনে আসবে।

প্রাবন্ধিক জীবন মৃত্যু মানব জীবনের এই চিরন্তন সত্য বিষয়টি নিয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য নিয়ে রসগ্রাহী মত দিয়েছেন, দার্শনিকমনের অধিকারী বিজ্ঞানবিদ্ রাজশেখর বসু দেশ বিদেশের দর্শন নিয়ে পাঠকের সঙ্গে গল্পচ্ছলে এই জটিল বিষয়কে সাধারণ মনোগ্রাহী ভাষায় আলোচনা করেছেন।

পদার্থভিত্তিক তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানের বিষয় আর ভাবভিত্তিক তত্ত্বনির্ভর দার্শনিক মনন সুতরাং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত বিষয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লোকগ্রাহ্যতা প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে অতিন্দ্রীয় ভাব ভাবনার তত্ত্ব বিশ্লেষণে দার্শনিক মত ও পথের নানা শাখা প্রসারিত হয়ে উঠে। বিষয়গত বৈচিত্র্যেই তারা ভিন্নধর্মী আলোচনা সাপেক্ষ।

## বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি (১৯৫১)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, যা দিয়ে নিশ্চয় জ্ঞান হয় বা বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে নানা প্রকার তার নাম প্রমাণ দেখা যায়। সংখ্য দর্শনে —— প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তবাক্য, চার্বাক দর্শনে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রাহ্য।

প্রত্যক্ষ (perception) অনুমান (inference) এবং আপ্তবাক্য (authority) ——

এই ত্রিবিধ প্রমাণ বুদ্ধিজীবিরাও মেনে থাকেন। আপ্তবাক্য অর্থাৎ — বেদাদিতে যা আছে বা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ – চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য পাওয়া যায়।

অনুমান – পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করতে অনুমানের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন — চন্দ্র–সূর্য–পৃথিবীর গতির নিয়ম থেকে গ্রহণ বা জোয়ার–ভাঁটা গণনা।

আপ্তবাক্য – অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত মেনে নিলে।

আদালতে বিচারকের কাছে বাদী প্রতিবাদীর রেজিষ্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ে অনুমানের সাহায্য নেন। কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত বা রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন আপ্তবাক্যের আশ্রয় নেওয়া হয়।

Scientific mentality বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অর্থাৎ গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে সংস্কার ও পক্ষপাত দমন করে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রে সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ ও অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তাই তিনি নিজের প্রত্যক্ষের সঙ্গে অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ বিচার করেন। --- ''অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প (hypothesis) ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে।''[২৪] তাই বিজ্ঞানীরা সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা (Probability)–র অধীন বলে মনে করেন।

চার–পাঁচশ বৎসর পূর্বে কেউ–কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারতেন। বর্তমানে যা অসম্ভব। মানুষের জানার ইচ্ছার শেষ নেই, সাধারণ মানুষ যা জানতে চায় তার নমুনা স্বরূপ লেখক কয়েকটি প্রশ্ন দিয়েছেন — ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না ? পাতি বা

কাগজি লেবু কোনটায় ভাইটামিন বেশী ? মিছরির ফুড–ভ্যালু কি চিনির চাইতে বেশী ? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয় ? নূতন সিমেণ্টের মেঝে ঘামে কেন ? সাপ নাকি শুনতে পায় না ? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না ? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না ? বাসন মাজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন ?

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে সব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান হয়নি তার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আবার অনেক সরল প্রশ্নের উত্তর দুরূহ হতে পারে যা অল্পশিক্ষিত লোক বুঝতে পারবে না। কিন্তু কখনও প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। উত্তর না জানলে সবসময়ই জানি না বলার শক্তি থাকা উচিত। আমেরিকান লেখক William beebe-র 'Jungle Peace' গ্রন্থ থেকে প্রাবন্ধিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন — "These words should be ready for instant use by every honest scientist - 'I don't know."[২৫]

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করার আগে তন্ন তন্ন বিচার করলে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়বে তবে উপযুক্ত প্রমাণ পেলে সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকলেই যথেষ্ট ।

অল্পদর্শিতা, অসতকর্তা ও অন্ধসংস্কারের ফলে লোকের বিচারে যে ভুল হয় তার প্রমাণস্বরূপ লেখক কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন —

যদুবাবু সুশিক্ষিত লোক কিন্তু ব্ল্যাক আর্ট নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললে যে, যাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি, টেবিল চেয়ার খরগোশ বের করছে, নিজের মুণ্ড সুন্দরী নারীতে পরিণত হচ্ছে, এই গুলি অবশ্যই অলৌকিক শক্তি। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, রঙ্গমঞ্চ কালো কাপড়ে মোড়া, বাইরে চারিধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। কালো কাপড়ে ঢাকলে জিনিস অদৃশ্য এবং ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়ে পড়ে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শোনা যায়। অনেকে আবার বলেন ‘‘বড়

বড় প্রফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক হয়ে গেছেন''।[২৬] কিন্তু প্রফেসর, উকিল, ডাক্তার নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হলে 'অলৌকিক' রহস্য ভেদ তাদের কর্ম নয় । রামায়ণে সীতা বলছেন, ''অহিরের অহেঃ পাদান বিজানাতি না সংশয়ঃ''[২৭] —— সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। তবে অলৌকিক মহাপুরুষের কাপড় বা শরীর তল্লাশি করতে চাইলে তাদের ভক্তরা অবশ্যই মারতে আসবেন।

রামবাবু স্থির করেছেন বেলিণ্ডা জেলার লোক চোর হয় কারণ, তার চাকর ওই জেলার লোক সে ঘড়ি চুরি করে পালিয়েছে । তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ি কাজ করে সেও বাজারের পয়সা থেকে কিছু-কিছু সরায়।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন, এই বৎসর গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি ও মহাগুরু নিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে এবং আশি বছরের তাঁর পিতামহী মরেছেন। তাই ফলিত জ্যেতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমবস্যা পূর্ণিমায় বাতবৃদ্ধি, অম্বুবাচীতে অধিক বৃষ্টি অশ্লেষা মঘায় যাত্রায় বিপদ ইত্যাদি ধারণা শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান (statistics) কেউ অবলম্বন করেন নি।

স্বজাতির উপর চটা বিপিনবাবু এক সভায় বললেন, 'বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র' —— ফলে তাঁকে মার খেতে হল। এই কথা পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে বলেছিলেন কিন্তু ''বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যে প্রকার, বস্তু সম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সে প্রকার না হতে পারে।''[২৮]

প্রচুর প্রমাণ না পেয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যেমন এককালে মানুষের বিশ্বাস ছিল স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে দেখা গেল duck-bill স্তন্যপায়ী কিন্তু

অন্ডজ। তাই বলা যায় অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী জরায়ুজ। তেমনি সাদা বেড়ালের নীল চোখ থাকলে ডারউইন লক্ষ্য করেছেন সে কালা হয় কিন্তু সাদা লোম নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয় নি তাই বলা যায় সাদা লোম নীল চোখের বেড়াল সম্ভবত কালা হয়।

মিত্র মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয় — প্রবাদে প্রমাণ নেই তবে লোকে বিশ্বাস করে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জিজ্ঞাসা গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ লেখক তুলে ধরেছেন, সেখানে দেখা যায় প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ফলিত জ্যোতিষকে যারা বিজ্ঞান বলতে চান তাঁরা প্রতিপাদ্য নিয়ম খুলে বলুন এবং জন্মকালে মানুষের গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি কিভাবে দেখে গণনা করছেন তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। --- ''ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না।''[২৯] হাজার শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরে দেখে পূর্বের নিয়মানুসারে গণনা করে তার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করতে হবে। সব ফলাফল প্রত্যক্ষ ভাবে মিলে গেলে ঘোর অবিশ্বাসী ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাসে বাধ্য হবে । হাজারের জায়গায় যদি লক্ষটা কোষ্ঠী মিলাতে পার — তবে এই বিচার আরো ভাল হবে। ''সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে।''[৩০]

Begging the question — এক শ্রেণীর কুযুক্তির নাম অর্থাৎ যা প্রশ্ন তা ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা । যেমন —

প্রঃ– কাঠ পোড়ে কেন ?

উঃ– কাঠ দাহ্য পদার্থ ।

প্রঃ– ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন ?

উঃ– তোমার dyspnoea হয়েছে ।

প্রঃ– গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন ?

উঃ– গাঁজা মাদক দ্রব্য ।

প্রঃ– রবার টানলে বাড়ে কেন ।

উঃ– রবার স্থিতিস্থাপক ।

প্রঃ– ডি–ডি–টিতে পোকা মরে কেন ?

উঃ– জিনিসটি কীটঘ্ন ।

খবরের কাগজ ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় এমন যুক্তি আরও দেখা যায় – যথা – ''প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল ।''[৩১]

কাকতালীয় ন্যায় বা Post hoc, propter hoc অর্থাৎ পূর্বের ঘটনাকে যদি পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। যেমন – একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দেওয়ায় এক বছরের মধ্যে গাছে ফল ধরল। প্রাবন্ধিক বলেছেন, বার বার না মিললে কার্যকারণ – সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

লোক নিজের শিক্ষা ও সংস্কার অনুসারে কার উপদেশ গ্রহণীয় তা স্থির করে। যেমন – পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে —— সরকার বলছে টীকা নাও, ভটচার্জি মশায় বলছেন শীতলা মায়ের পূজা কর। যারা মতি স্থির করতে পারেন না তারা দুটোই করেন।

বিজ্ঞাপন —— এক নূতন রকমের আপ্তবাক্য। ''বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা

হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে।"[৩২] আইন বাঁচিয়ে নিজের সুনাম রক্ষা করে মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের সাহায্যে সাধারণকে আকর্ষণ করে। এক ব্যবসায়ী ঘোষনা করেছেন — Beware of night starvation, রাত্রে জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডে পিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনি ভাবেন রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খাওয়া উচিত।

লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, বিজ্ঞানের এক ছাত্র নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছে লেখক প্রশ্ন করলেন যে সে কি করছে ? সে উত্তর দিল যে পরীক্ষা করছে এই কেশতেলে মারকিউরি পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ মুক্ত কি না। ন্যায়শাস্ত্রে একে বলে কাকদন্ত গবেষণা অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত খোঁজ করা। যেমন সন্দেশ রসগোল্লার তেমনি কেশতৈলে পারা সীসে থাকার কারণ নেই — বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা।

বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক সত্যের সন্ধান করেন অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মতে অসহিষ্ণু হন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলে বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন, শিক্ষিত মানুষ উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করলে সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে এবং ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষের ও অবসান হবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মূল পন্থা হিসেবে বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে স্বীকৃত প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আপ্ত বাক্যকে মূলত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রত্যক্ষনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পর্যালোচনায় বহু পরীক্ষিত, পূর্বানুমান সাপেক্ষ এবং যুগ–লব্ধ সিদ্ধান্তের সমর্থনে (আপ্তবাক্য) লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাত্রা স্থির হয়। সেইসূত্রে

লেখক অপবিজ্ঞান, যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি তথাকথিত বিজ্ঞান নামে প্রচলিত বিষয়ের ভিত্তিহীনতাকে যুক্তিগ্রাহ্য সংবেদনশীল উদাহরণ ভূয়িষ্ট ভাব ও ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন।

## জন্মশাসন ও প্রজাপালন (১৯৫৩)

পুরাণের প্রসঙ্গ টেনে প্রবন্ধের সূচনা, মানব ও দানবের পীড়নে বসুন্ধরার ত্রাহি–ত্রাহি রবে নারায়ণ কৃপাবিষ্ট হয়ে ভুভার হরণ করেন। প্রাবন্ধিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পুরাণোক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন – কোনও প্রাণিসংঘ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না অথবা নিজের সমাজগত বিকারের প্রতিবিধান করতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক জীব ও সমৃদ্ধ মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পৃথিবী এখন একসত্তা, তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সর্বদেহের অল্পাধিক বিকারের সম্ভাবনা আছে। প্রাচীনকালে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যোগ অল্প ছিল তাই নেপোলিয়নের আমলে ইওরোপ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও এশিয়া তা থেকে দূরে ছিল। বর্তমানে এক দেশের সমস্যা অপর দেশকে প্রভাবিত করে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ছাপ রেখে গেছে।

বহুদেশের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। কবি হেমচন্দ্রের ভারতভূমি বিংশতি কোটি মানবের বাস', খন্ডিত ভারতে লোক সংখ্যা ৩৬ কোটি এবং বৎসরে ৫০ হাজার লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর লোক সংখ্যা ২০ বৎসর আগে ১৮৫ কোটি ছিল এখন ২০০ কোটির বেশী হয়েছে। সমৃদ্ধ দেশে প্রজাবৃদ্ধির হার বেশী। ''পৃথিবীতে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ভূমি এবং খনিজ উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ, যা আছে তার যথোচিত বিভাগ হলে সমস্ত মানবজাতির উপস্থিত প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ও অন্যান্য কারণে তা অসম্ভব,

ভারতের নানা স্থানে বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ব্রিটেন জার্মানি ইটালির বাড়তি প্রজা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় আশ্রয় পাচ্ছে কিন্তু সেসব দেশে ভারতীয় বা জাপানি প্রজার বসতি নিষিদ্ধ।''[৩৩]

প্রাবন্ধিক প্রায় দেড়শ বৎসর পূর্বে মালথসের কথা বলেছেন, খাদ্যের উৎপাদন যে হারে বাড়ানো যেতে পারে তার তুলনায় জনসংখ্যা বেশী গুন বেড়ে যাবে, অতএব জন্ম শাসন আবশ্যক নতুবা খাদ্যাভাব হবে। ভারতবাসীর মানসিকতায়, যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। ভারতে যদি ও ভূমির অভাব নেই কিন্তু সবকিছুর একটা পরিমিতি আছে তাই জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি অবশ্যই পরবর্তিকালে সমস্যার সৃষ্টি করবে। ''অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমায় নয়, ভাবী মহাযুদ্ধে নয়, গ্রহনক্ষত্রের সংঘর্ষে ও নয়, বর্তমান সভ্যসমাজের রীতিনীতিতেই এমন বিকারের বীজ নিহিত আছে যার ফলে অচির ভবিষ্যতে মানবজাতি সংকটে পড়বে।''[৩৪]

প্রাবন্ধিক বৃহৎ জনসংখ্যার সংকটের স্থূল আভাস দেওয়ার জন্য দুটি কাল্পনিক দেশের বিবরণ তুলে ধরেছেন — মনুজরাজ্য ও দনুজরাজ্য।

মনুজরাজ্য — ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর প্রজা সেখানে আছে, রোগপ্রতিষেধ, চিকিৎসা, শিক্ষাপ্রসার, শিল্পপ্রসার, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে। কালক্রমে প্রজাবৃদ্ধি অত্যাধিক হল, জন্মশাসনের নিশ্চিত উপায় ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হল, অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণী শিখতে চাইল না কারণ ''ইন্দ্রিয়সেবা সর্বাপ্রেক্ষা সুলভ বিলাস''[৩৫] শাসক বর্গ ভাবলেন কালক্রমে এই নিম্নশ্রেণীর লোক শিক্ষিত হয়ে ভদ্রজনের আচরণ অনুসরণ করবে। একটা আশঙ্কা যে সর্বসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হলে প্রজাসংখ্যা কমে যাবে। এর প্রতিকারে লেখক বলেছেন, বহু সন্তানবতীকে

পুরস্কার দিলে জন্মের হার বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ হিটলার ও মুসোলিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন।

এই রাজ্যে খাদ্য বাসস্থান এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকায় অকালমৃত্যু কমে গেল, বৃদ্ধ, পঙ্গু, দুর্বল, অসাধ্য রোগীও দীর্ঘকাল বাঁচতে লাগল। ''অবশেষে অতিপ্রজতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্থানাভাব, খাদ্যভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি প্রকট হয়ে উঠল, মনুজরাজ্যে মৎস্যন্যায়ের লক্ষণ দেখা গেল।''[৩৬]

বোম্বাই–এ সার্বজাতিক জন্মশাসন সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, ''মানবের হিতার্থে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণই সভ্যতা। প্রাণিজগতে কারা বেঁচে থাকবে তা প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ---- ব্যাধি বন্যা দুর্ভিক্ষাদি নিবারিত করে আমরা প্রজার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছি, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি, তার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে। জন্মশাসন ভিন্ন এই সংকটের প্রতিকার হবে না।''[৩৭] মোটকথা যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু নিবারিত হলে যদি যথেষ্ট জন্মনিরোধ না হয় তবে প্রজাসংখ্যা ভয়াবহরূপে বাড়বে।

দনুজ রাজ্যের শাসকবর্গ সমাজ হিতৈষী, কিন্তু নির্মম। অল্প স্থানে অনেক চারাগাছ হলে তারা বিনা দ্বিধায় অতিরিক্ত গাছগুলিকে উপড়ে ফেলে দেয়। পাশ্চাত্য দেশে অতি প্রিয় গৃহপালিত পশুকে সযত্নে পালন করে কিন্তু অসাধ্য রোগ হলে প্রিয় জন্তুকেও মেরে ফেলে। ভারতবাসী জন্তুর তেমন যত্ন না নিলেও রূগ্ন জন্তুকে মারতে তার সংস্কারে বাধে। উদাহরণ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী তাঁর আশ্রমের একটি রুগ্ন জন্তুকে ইনজেকশন দিয়ে মারায় বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত নিন্দা করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে জন্তুর বেলায় যে রীতি দনুজ রাজ্যে মানুষের বেলাও তাই করা হয়। দনুজরাজ্যে শুধু বাছা বাছা গুনী বৃদ্ধ বেঁচে থাকতে পারেন।

দনুজ রাজ্যের মতে মনুজ রাজ্যের শাসনপ্রণালী অতি সেকেল আর অবৈজ্ঞানিক।

মনুজ রাজ্যের মত হল দনুজ রাজ্যের শাসকবর্গ ধর্মভ্রষ্ট ইহসর্বস্ব নরপিশাচ, প্রজারা মনুষ্যাকৃতি পিপীলিকা।

চণ্ডীদাস বলেছেন ও মহাভারতে আছে সবার উপরে মানুষ সত্য। এই মানুষ কারা, ভারতের প্রাচীন মানুষ বাদ এবং আধুনিক humanism কি এক ? প্রাবন্ধিক বলেছেন, মহাভারতে সনৎকুমারের বাক্যে আছে, ''যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম''[৩৮], অর্থাৎ যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য বা অবলম্বনীয়। মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন — ''ধারণাদ্ধর্ম মিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ — ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এই জন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে।''[৩৯]

যে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে, প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত করে এবং দুঃখতপ্তগণের আর্তিনাশ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী সেই সমঞ্জস ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, প্রবন্ধিক বলেছেন কিন্তু তার অন্বেষণ উপেক্ষা করলে চলবে না।

রাজশেখর বসু বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিক তাছাড়া তিনি একজন সুদক্ষ ব্যবসা পরিচালক ও দেশপ্রেমী, সুস্থ সবল সমস্যামুক্ত দেশ তাঁর কাম্য। কিন্তু যে সমস্যা আমাদের কাছে পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকেই লেখক চোখে আঙুল দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তির পথ ও তিনি নির্দেশ করেছেন। পুরাণ থেকে উদাহরণ তুলে বলেছেন ''মানব ও দানবের পীড়নে বিপন্ন বসুন্ধরা যখন ত্রাহি-ত্রাহি রব করতে থাকেন তখন নারায়ণ কৃপাবিষ্ট হয়ে ভূভার হরণ করেন।''[৪০]

পুরাণের ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেও তুলে ধরেছেন। অধিক জনসংখ্যা শুধু এক দেশের এক কালের নয় সমস্ত পৃথিবীর — এখানে আধুনিক বিশ্বায়ণের কথা মনে

পড়ে।

প্রজাবৃদ্ধিতে দেশের সমস্যা কিরূপ হতে পারে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি মনুজ রাজ্য ও দনুজরাজ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র এবং সেই দুই রাজ্যের মানসিকতা অঙ্কিত করেছেন। দুই দেশ ভিন্ন পন্থা ও মানসিকতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। এই গল্পবলার মধ্যে যেন পরশুরামের উপস্থিতি অনুভব করি। যথোচিত প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্মত একটি পদ্ধতি নিয়ে যদিও প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধ শুধু বিজ্ঞানের পাঠ্য নয় এটি সাহিত্যরসে রসায়িত করে লেখক আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে দক্ষ রাজশেখর বসু প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা যথাযথ। বিজ্ঞানের একটি বিষয়কে স্পষ্টীকৃত করার জন্য যতটা শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন তাই তিনি করেছেন অলংকারে মণ্ডিত করে অহেতুক ভাষাকে জটিল করার প্রয়াস করেননি। সমাজ মানসের সার্বিক চিন্তা ও তাতে যুক্তিসিদ্ধ শাণিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় ——

''পৃথিবী একসত্তা হলেও একাত্মা হয় নি''[৪১]

''শিক্ষিত জনের তুল্য তাদের চিত্তবিনোদনের নানা উপায় নেই, ইন্দ্রিয়সেবাই সর্বাপেক্ষা সুলভ বিলাস, তাতে কিছুমাত্র বাধা তারা সইতে পারে না।''[৪২]

''অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমায় নয়, ভাবী মহাযুদ্ধে নয়, গ্রহণক্ষত্রের সংঘর্ষেও নয়, বর্তমান সভ্যসমাজের রীতিনীতিতেই এমন বিকারের বীজ নিহিত আছে যার ফলে অচির ভবিষ্যতে মানবজাতি সংকটে পড়বে।''[৪৩]

''পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র যদি স্বার্থ বুদ্ধি ত্যাগ করে সর্ব মানবের হিতার্থে একযোগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে সংকট নিবারিত হতে পারে।''[৪৪]

''যদি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা হয় এবং

যথেষ্ট জন্মনিরোধ না হয়, তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে।''[৪৫]

যদিও নিদিষ্ট লক্ষ্যভেদী ভাষা আমরা রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে পাই কিন্তু তার থেকে আমরা সাহিত্য রসও লাভ করতে পারি। তাই বিজ্ঞানের বিষয় হলেও এ প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের সামগ্রী। লোককথা ও পুরাণ জ্ঞানে লেখকের অর্ন্তদৃষ্টি শাণিত ও নির্মোহ।

রাজশেখরের ভাষা খুব সাদামাটা সহজ সরল হলেও সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যেমন —— কৃপাবিষ্ট, ভূভার, পুরাণোক্তি, অল্পাধিক, অন্নাভাব, স্থানাভাব ইত্যাদি।

প্রবন্ধে যুক্তিসিদ্ধভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিরাট সমস্যাকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন, সমাধানের কথা কিছুটা বন্ধুর মতো আমাদের পরামর্শ দেন কিন্তু কোথাও তাঁর মত মানতেই হবে এভাবে কিছু তিনি বলেন না এর ভার সম্পূর্ণ পাঠকের উপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আকাশ পাতাল ঘুরিয়ে এনে সমে ছেড়ে দেওয়া।

প্রবন্ধের শেষে লেখকের পরামর্শ ''যে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত করে এবং দুঃখতপ্তগণের আর্তিনাশ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী সেই সামঞ্জস ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ কিন্তু তার অন্বেষণ উপেক্ষা করা চলবে না।''[৪৬]

প্রত্যক্ষের অনুপঙ্খকে অবলম্বন করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা বিজ্ঞান ভিত্তিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনিষ্ট। রাজশেখর তাঁর অসাধারণ কৌতুকমিশ্র রসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আম-জনতার নিত্যদিনের বাস্তব বিজ্ঞানকে রসসাহিত্যের বিষয়ীভূত করে পরিবেশন করেছেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ভাষা বিজ্ঞানের কলা-কৌশল এবং মানব চরিত্রের গহন জটিলতা সরস ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে তাঁর বিজ্ঞানধর্মী রচনায়। জীবজগতের জটিল রহস্য এবং মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা উভয়কেই তিনি যথার্থ লক্ষ্যভেদের সাথে তাঁর

প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন যাতে রসিক চিত্ত সাহিত্য রস এবং বিজ্ঞান রস একই পাত্রে পান করতে পারে।

## বিজ্ঞানের বিভীষিকা (১৯৫৫)

একটি পূর্ব ঘটনা দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত। দশ–এগারো বছরের দুই মাসতুতো ভাই মুখোমুখি ঝগড়া করছে এবং হয়ত একটু পরেই ইট ছুঁড়ে মারবে – এবং সাংঘাতিক পরিণাম দুজনেই জানে তবুও তারা প্রস্তুত, পরে মামা এসে এদের নিরস্ত্র করলেন।

মার্কিন ও সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত লেখক রসিকতা করে বলছেন ''ওঁদের মামা নেই''[৪৭] দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জনজীবন বিপর্যস্ত এরই মধ্যে আবার দুই রাষ্ট্র পরমাণু বোমা নিয়ে পরস্পরকে ভয় দেখাচ্ছে। অনেকের মতে, ''এই পৃথিবী ব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি।''[৪৮]

তাঁদের যুক্তি হল, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যুদ্ধ এত ভয়াবহ হয়েছে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স – প্রুশিয়া, ব্রিটিশ–বোঅর, রুশ–জাপান — যুদ্ধগুলি দুপক্ষের সেনার মধ্যে হয়েছিল ফলে আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। বর্তমানে পরমাণু বোমা মেশিনগান, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরিন, বোমা–বর্ষী বিমান প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য আজ যুদ্ধ আরো বেশি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও মানুষ চিন্তান্বিত কারণ হয়ত বা উৎকট উপায় আবিষ্কার হবে যার ফলে মহামারীর বীজ বিপক্ষ দেশকে নির্মনুষ্য করবে বা এমন গ্যাস, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের উদ্ভাবনের ফলে দেশের লোক জড়বুদ্ধি ভেড়ার পালের মত আত্মসমর্পণ করবে। মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু ''বহিঃ– প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃ প্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি''[৪৯] মানুষ যুগ যুগান্তর ধরে

সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির মধ্যে জড়িয়ে আছে ফলে — ''অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর।''[৫০] তাই বিজ্ঞানচর্চা বিশেষ করে রসায়ণ ও পদার্থবিদ্যাই যত অনিষ্টের মূল — এই বিদ্যাচর্চা স্থগিত রেখে চন্দ্রালোকের বিমান, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশ বিদেশে আলাপ, রেশম থেকে মজবুত কাপড় তৈরী করা হোক। মূলকথা মানুষের ধর্মবুদ্ধি বাড়ার চেষ্টা করা উচিত।

বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকদের মতে —— বিজ্ঞানের যখন এত উন্নতি হয় নি তখন ও মানুষের সংকট ছিল —— থার্টি ইয়ার্স ওঅর, নেপোলিয়নের যুদ্ধ, ক্যথলিক – প্রোটেষ্টান্টের ধর্মযুদ্ধ, তুর্কের ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান–মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ইত্যাদিতে প্রাণহানি এবং বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগও দেখতে হবে —— খাদ্যোৎপদান বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে লোকের পরমায়ুও বেড়েছে। তাছাড়া রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মটরগাড়ি, এরোপ্লেন, সিনেমা, রেডিও প্রচলনেও মানুষের অনেক সুবিধে হয়েছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, প্রথমে আমাদের ভাল করে জানতে হবে — বিজ্ঞান শব্দের অর্থ ও মানবস্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ। সায়েন্স বা বিজ্ঞান দুই শ্রেণীর বিদ্যা ''দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্প সাধনা।''[৫১] মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞান এই দুই ধারায় প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে ——

''মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব কী লাগি একাকী

ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে।"[৫২]

বিস্ময়ে ফলে যাঁরা রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। বিস্ময়ের মূলের রহস্য সমাধানের চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা আবার দুভাগে বিভক্ত —জ্ঞান লাভে যারা তৃপ্ত হন – তাঁরা নিষ্কাম শুদ্ধ বিজ্ঞানী। নিজের বা পরের লব্ধ জ্ঞান সকাম ফলিতবিজ্ঞানী কাজে লাগান।

জ্যোতিষের বেশিরভাগ তত্ত্ব নিষ্কাম বিদ্যা যেমন – হেলির ধূমকেতু ছিয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা যায়, মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠেছে – এই তত্ত্ব জেনে আমাদের আনন্দ হয়। আবার চুম্বক লোহা টানে তার এক প্রান্ত উত্তরে এবং অপরপ্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয়। — প্রথমে তা শুধু জ্ঞান ও কৌতুহলের বিষয় ছিল পরে তা মানুষের কাজে লেগেছে। কার্য ও কারণের সম্বন্ধ যারা ভাল করে জানতে চায়, তারাই বিজ্ঞানী।

কাণ্ডজ্ঞান (Common sense) সাধারণ অভিজ্ঞতা আর বিজ্ঞান – স্থুল সূক্ষ্ম সব জ্ঞান পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান দিয়ে লাভ করতে হয় কিন্তু সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত ও তাতে কার্যকারণ যথাসম্ভব নিরূপিত যাতে হয় তাই যথার্থ বিজ্ঞান।

নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী দম্পতি প্রধানত শুদ্ধ বিজ্ঞানী। এঞ্জিন, টেলিফোন, ফোনোগ্রাফ, রেডিও, রাডার, সালভার্সন স্ট্রেপেটোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধ, বন্দুক, কামান, অ্যাটম – হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতির উদ্‌ভাবক ফললাভের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করেন। নব–নব তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রয়োগ উভয়েই বিজ্ঞান তবে বিদ্যার অপপ্রয়োগ হলে তা ভয়ংকর রূপ নেয়। ''মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে।''[৫৩] প্রাবন্ধিক বলেছেন কিন্তু দুষ্ট লোকের কুকর্মের জন্য কোন বিদ্যাচর্চা স্থগিত রাখা যায় না। কারণ বিজ্ঞান অপপ্রয়োগের জন্য দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানব স্বভাবের।

শক্তিশালী জনমতের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রও যেতে পারে না। যেমন – প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ–গ্যাস ছাড়া হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তা হয়নি। প্রখর জনমতের বিরুদ্ধে পরাক্রান্ত রাষ্ট্রও সংযত হতে বাধ্য হয়।

প্রাবন্ধিক জনমতের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, জনমত সমাজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধন করতে পারে যেমন – ক্রীতদাস প্রথা লোপ, শক্তিশালী রাষ্ট্রের উপনিবেশবাদ ও দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাবে। তাছাড়া আফিম কোকেন মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপ ব্যবসায়ে নারীহরণ প্রভৃতি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। সেভাবে পরমাণু শক্তির প্রভাবও লোকমতে হয়ত বা হ্রাস পেতে পারে।

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা – এক কালে পাশ্চাত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল। বর্তমানে মহৎ চিন্তা আছে যদিও সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে সর্ববিধ ভোগ বাড়ালে মানবজীবন সার্থক হওয়ার কথা বলা হয়। ''এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান।''[৫৪] পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় দুর্নীতি বাড়ছে পরিণামে লোভ ঈর্ষা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। দরিদ্র দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন – তাই বিজ্ঞানচর্চা আবশ্যক।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তনে যে মানুষ নব পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা খাপ খাওয়াতে পারেনি তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও এই পরিবর্তনে সাহায্য করে যেমন – দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু, ম্যালেরিয়া, যক্ষা প্রভৃতি যথাক্রমে হ্রাস পেয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাচ্ছে।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্গ ছিল বর্তমানে বিজ্ঞান পঞ্চম

পুরুষার্থ। তবে ''কোনও নববিস্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব।''[৫৫] পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয় কিন্তু অসতর্ক প্রয়োগ জীবাণু বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসলিনে মরে না। বিকিনিতে পারমানবিক বোমার পরীক্ষার ফলে জাপানী জেলেরা ব্যধিগ্রস্থ হয়েছিল তা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। ''বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্চিত ফলও দেখা দিতে পারে।''[৫৬]

যে কোন কিছুরই সুফল ও কুফল দুইই থাকে। তেমনি বিজ্ঞান শুধু বিভীষিকাময় নয়, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সমাজের অনেক সুবিধাও হয়েছে। এই দুই বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা যুক্তি ও তথ্যসহ এই প্রবন্ধে নিরূপিত করেছেন। মানবের প্রবৃত্তি – এই ভাল মন্দের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাছাড়া সমাজ পরিশোধনে জনমতের প্রভাব সর্বাধিক, উদাহরণরূপে – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিষ–গ্যাসের সংযম, ক্রীতদাস প্রথাও নিবারিত হয়েছে।

পরিবর্তনশীল সভ্যতায় যারা নিজেদেরকে সময়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পেরেছে তারাই সভ্যসমাজে এগিয়ে গেছে, অন্যরা পারেনি। আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ফল 'আশীর্বাদ না অভিশাপ' – এই নিয়ে যে ভিন্ন মতবিরোধ সে সম্বন্ধে লেখক সহজ ভাষায় যুক্তি উত্থাপন করে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিজ্ঞানকে তিনি সায়েন্স ও বিজ্ঞান এই দুই ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। ''বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে যেমন তাঁর আস্থা, তেমনি তার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ যে মানবতাবিরোধী তাও তিনি স্পষ্ট করেই বলে দেন। পরিবেশ বিজ্ঞান তো এখন এই দিকটিতেই ঝোঁক দিচ্ছে। অনেক আগেই তিনি এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন।''[৫৭]

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মণি–কাঞ্চন যোগে রাজশেখর বসুর উক্ত প্রবন্ধে বিজ্ঞান বিষয়ে

নিরপেক্ষ সুস্থ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। সুরসিক লেখক চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির পঞ্চম বর্গ হিসেবে বিজ্ঞানকে স্থাপনা করেছেন এবং সর্বত্রই বিজ্ঞানসহ ও পঞ্চম পরুষার্থের নিয়ন্ত্রক যে মানুষ তার দিকেই তাঁর তর্জনী সংকেত। দূরদর্শী লেখক নিয়ন্ত্রক মানুষের বোধ এবং বিবেকের উপরই জড় বিজ্ঞান বিশ্বের আশীর্বাদ – অভিশাপের লক্ষ্য নিশানার ট্রিগারের চাবি দিয়ে রেখেছেন।

## আমিষ ও নিরামিষ ( ১৯৫৭)

এই প্রবন্ধে কথোপকথন ছলে বন্ধুদের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য যুক্তিসম্মত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মথুর মুখুজ্যে, আঘোর দত্ত ও ফণী মল্লিক তিন বন্ধু সকালবেলা পার্কে বসে গল্প করছে। আটত্তর বছরের অঘোর দত্ত নিরামিষভোজী এবং এই বয়স পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থ। মথুর মুখুজ্যের বয়স পঁচাত্তর তিনি আমিষভোজী, বাত হাঁপানি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। ফণী মল্লিক ষাট বছরের বিলাত ফেরৎ ব্যক্তি, তার কাছে আমিষ নিরামিষ সম্বন্ধে মতামত তারা চেয়েছেন। ফণী মল্লিক বললেন, ''– আমিষের অভাবেই হিন্দু জাতির অধঃপতন হয়েছে।''[৫৮] ফণী মল্লিকের কথায়, মাছ মাংস ডিম খেলে পুষ্টি ও শক্তিলাভ হয়, যারা নিরামিষভোজী তাদের দুধ, ক্ষীর, ছানা খাওয়ার সামর্থ্য থাকা চাই।

মথুর বাবুর প্রশ্ন, মাংস খেলে হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়, তার মতে যারা মাংসখোর তারাই দাঙ্গাবাজ। ফণি মল্লিক যুক্তিস্বরূপ আর্য্য জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন রাম–সীতা–লক্ষণ ও বনবাসী পাণ্ডবরা বনে মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। ''আমাদের মাংসাশী পূর্বপুরুষরা তেজস্বী মহাবীর ও যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন

আবার বেদ–বেদান্তও রচনা করেছেন।''[৫৯] অঘোর বাবু বলেছেন, আমিষ নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসের জন্য মানুষ ভাল মন্দ হয় না কারণ তৃণভোজী গণ্ডার মোষ ও ষাড়ের ক্রোধ খুব কম নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ'খানেক শিশুকে নিয়ে যদি একই পরিবেশে পঞ্চাশ জনকে আমিষ ও পঞ্চাশ জনকে নিরামিষভোজী করে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা তবে এ বিষয় একটি পরিষ্কার চিত্র আমাদের চোখে ফুটে উঠবে।

ফণী মল্লিক বলেছেন, শুধু বেশী মাংস নয়, অতিরিক্ত তেল, ঘি, মিষ্টান্নও অনিষ্টকর। তবে সকল দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে চলতে হলে সভ্য লোক সর্ব দেশে যা খায় তার উপর আমাদেরও ঘৃণা থাকা চলবে না। তাছাড়া মানুষ আজ দেশ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে তাই সকল পরিবেশের খাদ্যভ্যাস তাঁর জীবনযাত্রায় সহায়ক হবে। অঘোর বাবু দেখাচ্ছেন, অতি প্রাচীন মানবজাতি বনের পশু পক্ষী ফল এমনকি নরমাংস পর্যন্ত খেত কারণ যা জুটত তাই খেত। কালে মানুষ সভ্য হল খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য দেখা গেল। এখনও কিছু মানুষ আছে যারা আদিম জনজাতির খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্থ। অঘোর বাবু বলছেন, আমিষ খাদ্যে টোমেইন এবং নানা রকম ক্রিমি কীট জন্মাবার সম্ভাবনা বেশী। ফণী মল্লিক বলছেন, নিরামিষ খাদ্যে এসেনশ্যাল আমিনো – অ্যাসিডের অভাব।

যুক্তিপূর্ণ বাদানুবাদের পরে অঘোর বাবু বললেন, প্রবৃত্তিই বলবতী তাই পেটে যা সয় তাই খাও এবং ভবিষ্যতে মাছ মাংসের অনুকল্প উপাদেয় সুষম নিরামিষ খাদ্য হয়ত বা আবিষ্কৃত হবে যা হবে সকলের সুস্বাস্থ্যের উপযোগী।

খাদ্য – মানুষ বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে লেখক যুক্তিসিদ্ধভাবে তাঁর মত দিয়েছেন। আমিষ–নিরামিষ–খাদ্যাভ্যাসের এই ভিন্ন পন্থা মানুষকে জীবনপথে সুস্থভাবে চলতে কতটা সাহায্য করে লেখকের তাই পর্যালোচনার

বিষয়। বিজ্ঞানমনস্ক রাজশেখর বসু দুই ভিন্ন রুচির আহারের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি তুলে ধরেছেন।

''নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবি হয়, আনি বেসান্ট, বার্নার্ড শ, গান্ধীজী''[৬০]

''আমিষ খেয়েও বিস্তর লোক আশি পেরিয়ে বেঁচে আছেন, যেমন চার্চিল, ফজলুল হক, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।''[৬১]

''আমিষাশী লোকের তুলনায় নিরামিষাশীর সংযম হয়তো মোটের উপর কিছু বেশী কিন্তু তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।''[৬২]

''সভ্য মানুষের পোশাক যেমন প্রায় এক ধরণের হয়ে পড়েছে, সভ্য মানুষের খাদ্যও তেমনি ইউনিভার্সাল হওয়া দরকার।''[৬৩]

''হিন্দুর লোকাচার অনুসারে মাছ ছাগল ভেড়া হরিণ হাঁস ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণীর মাংস শুদ্ধ। শাস্ত্রে পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তু খাবার বিধানও আছে – খরগোশ শজারু গোসাপ গণ্ডার আর কচ্ছপ।''[৬৪]

''পৃথিবীতে বিস্তর প্রাণী আছে যারা বিধাতার বিধানেই আমিষাশী হয়েছে, হিংসার পাপ তাদের স্পর্শ করে না।''[৬৫]

সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সহজ সরল বিষয়কে লেখক বিজ্ঞান ও দর্শন এর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি খুব সাদামাটা ভাষায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং বিভিন্ন পন্থার কথাও বলেছেন, ''বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলছে, হাতি ঘোড়া থেকে পোকা মাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য। প্রবৃত্তি বলছে, বাছা বাছা গুটিকতক প্রাণীই খেতে ইচ্ছা করে। অন্তরাত্মা বলছে, নিরমিষেই যখন কাজ চলে তখন জীব–হিংসার দরকার কি।''[৬৬]

প্রবন্ধের ভাষা কথোপকথনের উপযোগী কিন্তু চরিত্রগুলির মেধা, যুক্তি তাঁর উপস্থাপন প্রণালীতে সংলাপধর্মীতা প্রবন্ধে নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। ভাষা শুধু বিষয়কে যথাযথ প্রকাশে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পরিমাপ মত ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য। খাদ্যের বিবরণ রসনার রসায়ণ হলেও তার মধ্যে আমরা সাহিত্যরস অনুভব করি।

সভ্যতা জঙ্গম, পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এই বিবর্তন সহজভাবে আমাদের মেনে নিতে হবে — একথা সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক আমাদের সচেতন করে দিয়ে বিষয়টিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি সিদ্ধতা দেখিয়েছেন। মানুষ সারাজীবন একই ভৌগোলিক পরিবেশে এবং একই পরিস্থিতিতে নাও থাকতে পারে তাই সব ধরণের খাদ্যাভ্যাস তৈরী করতে লেখকের বন্ধুর মত পরামর্শ দেখা যায়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গ নিরামিষ ও আমিষ ভোজনকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন, যে ব্যাখ্যা আধুনিক সমাজ জীবনে অপরিহার্য্য। এক সময় রাজশেখর বসু স্থুল দেহে বর্তমান ছিলেন কিন্তু অর্ধশতক পেরিয়েও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গি সময়োপযোগী তাই আজও রাজশেখর বসু প্রাসঙ্গিক ।

## স্নেহদ্রব্য (১৯৫৯)

'বনস্পতি–অভিধানিক অর্থ – পুষ্পব্যাতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি, বৃক্ষ মাত্র হিন্দীতে বনস্পতি মানে উদ্‌ভিদ। বনস্পতিকে, ডালডা, রসোই, কুসুম, পকাও ইত্যাদি নামে বিক্রি করা হয়। এই ডালডা বা হাইড্রোতেল প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী হত – বিভিন্ন বাদ প্রতিবাদ থাকলেও পরবর্তীকালে তা প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে এই হাইড্রোতেল উৎপাদন হচ্ছে এবং বিভিন্ন অভিযোগ ও উঠেছে তাই

এ বিষয়ে লেখক পাঠকদেরকে সচেতন করতে তেল ঘি হাইড্রোতেল প্রভৃতি নিয়ে কিছু তথ্য আলোচনা করেছেন –

স্নেহ (Fat) –

ইংরেজী ফ্যাট অর্থাৎ প্রাণিদেহের চর্বি, বিজ্ঞানের ভাষায় মাখন ঘি আর উদ্‌ভিদ তেল ফ্যাট–এর অন্তর্গত। ফ্যাট সংজ্ঞার প্রতিশব্দ চর্বি বা চর্বি – জাতীয় দ্রব্য। ইংরেজী শব্দের অনুকরণে সরষে তিল ইত্যাদিকে চর্বি বললে আমাদের সংস্কারে বাধে, তাই ইংরেজী ফ্যাট বলতে স্নেহ বা স্নেহদ্রব্য লেখা ভাল।

স্নেহাম্ল (Fatty acid) –

স্নেহ, শব্দের অর্থ স্নিগ্ধতা, চিক্কণতা বা তেলা ভাব, ভ্যাসেলিন, লুব্রিকেটিং অয়েলের রাসায়নিক গঠন স্নেহ বা ফ্যাটের সমান নয়। স্নেহ পদার্থের প্রধান উপাদান – গ্লিসারিন, কয়েক প্রকার স্নেহাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড।

অপূরিত (Unsaturated) ও প্রপূরিত (Saturated) –

স্নেহাম্লতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। যে স্নেহাম্লে হাইড্রোজেনের পরমাণু–থাকে, অপূরিত (অনসাটুরেটেড) এবং যাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কিছু কম আছে তাকে প্রপূরিত (সাটুরেটেড) বলে।

তেল, ঘি তে যে স্নেহাম্ল থাকে, তার মধ্যে অপুরিত ও প্রপূরিতের শতকরা হার মোটামুটি এরকম –

| | | অপূরিত | প্রপূরিত |
|---|---|---|---|
| ১) | সরষের তেল | ৫০ | ৫০ |
| ২) | তিল তেল | ৮৫ | ১৫ |
| ৩) | চীনাবাদাম তেল | ৭৫–৮৭ | ২৫–১৩ |
| ৪) | নারকেল তেল | ২ | ৯৮ |
| ৫) | ঘি (গাওয়া ভঁয়সায় কিছু তারতম্য আছে) | ২৯ | ৭১ |

সরষে চীনাবাদাম তেলে স্নেহাম্ল বেশি তাই শীতকালে তরল থাকে। ঘি ও নারকেল তেলে প্রপূরিত বেশী তাই ঠাণ্ডায় জমে যায়।

কোন তেল ভাল ?

তৈল শব্দের বুৎপত্তি অর্থই তিলজাত (Oilএর মৌলিক অর্থ Olive–জাত) আয়ুর্বেদে তিল তেলের প্রশংসা দেখা যায়। সরষে ও চীনা বাদামের তেল খেয়ে এমন কোন স্বাস্থ্যহানির খবর ও পাওয়া যায়নি তাই বলা যায় তিল, চীনাবাদাম ও সরষে তেল সুপাচ্য। তবে ঘি অবশ্যই বেশী পাচ্য ও পুষ্টিকর।

খাদ্যের রাসায়নিক গঠন -

মোটামুটি দেখা যায়, স্নেহদ্রব্যের মধ্যে যেগুলি তরল এবং অপূরিত স্নেহাম্ল বেশী তা সহজে জীর্ণ হয়। ঘি তে যদি ও প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী তবে তার লঘু গঠনের জন্য তা সুপাচ্য। ঘি'তে ভিটামিন এ এবং ডি আছে যা তেলে নেই। তিল তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল সব চেয়ে বেশী প্রপূরিত কম তাই তিল তেল পাচ্যতায় শ্রেষ্ঠ এবং এরপর চীনাবাদাম তেল।

খাদ্যদ্রব্য ভাজতে তেল থেকে ঘি বেশী আঁচ সইতে পারে, তাই প্রবাদে আছে – তেল পুড়লে ঘি, ঘি পুড়লে ছাই। তেল, চর্বি, হাইড্রোতেল বেশী আঁচ সইতে পারে।

হাইড্রোতেল -

'ঘি'–এর উপর ভারতবাসীর আসক্তি কারণ, ঘি–এর পুষ্টিকরতা বেশী। ঘি–এর উপর সাধারণের পক্ষপাত আছে তাই খারাপ ঘি–এ তৈরী খাবারে দুর্গন্ধ থাকলে মানুষ খুব একটা আপত্তি করে না। অনেকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সস্তা ভেজাল ঘি কেনে। তেলে ভাজা খাবারে যে একটা গন্ধ থাকে তা হাইড্রোতেলে থাকে না তাই ঘৃতপক্কের বিকল্পরূপে হাইড্রোতেলে পক্ক খাবার তৈরী হতে দেখা যায়।

হাইড্রোতেলে ঘি ব্যবসায়ীর ক্ষতি –

হাইড্রোতেল বন্ধ করে দিলে চর্বি মিশ্রিত ভেজাল ঘি–এর বিক্রি বাড়বে এবং খাঁটী ঘি এর দাম চড়বে। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচুর অসাধু ব্যবসায়ী আছেন কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অনেকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে হাইড্রোতেলে এমন রং দেওয়া হোক যাতে ঘি–এর মিশাল দিলে দেখে বুঝে নেওয়া যায়, লেখকের মতে লাল, নীল ইত্যাদি রঙের হাইড্রোতেল কেউ কিনবে না।

হাইড্রোতেলের দোষ –

হাইড্রোতেলে প্রপূরিত গাঢ় স্নেহাম্ল বেশী তাই তা সব হজম হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, খাদ্য হিসেবে তেল থেকে হাইড্রোতেল নিকৃষ্ট। সম্প্রতি শরীর বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্নেহদ্রব্যে প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী তাই, তা খেলে রক্তে কোলেষ্টেরল বাড়ে এবং থ্রম্বোসিস হতে পারে, তাই মাখন ঘি থেকে তরল তেল খাওয়া নিরাপদ।

ঘি এর অনুকল্প -

ভারতবর্ষে ঘি এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে মাখনের আদর। মাখন দুর্মূল্য তাই সেদেশে মাখনের অনুকল্প মার্গারিনের এর প্রচলন হয়েছে। স্বদেশে মাখন ও মার্গারিনের উপাদান

সমান না হলেও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশে ঘি এর অনুকল্প, উপাদান, লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত – আমাদের দেশে সরকার কতটা এ ব্যাপারে উদ্‌যোগী হবেন সন্দেহ আছে তবে জনমত প্রবল হলে আইন করতে বাধ্য হবেন।

কোন বিষয়ে চর্বি, গাঢ় হাইড্রোতেল ঘি এবং তরল তেলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

বর্ণ গন্ধহীন চীনাবাদাম তেলের দাম সাধারণ তেলের চেয়ে বেশী কিন্তু হাইড্রোতেলের চেয়ে কম। গুজরাটী, মারোয়াড়ী ঘি এর বদলে চীনাবাদাম তেল ব্যবহার করে। এই deodorized decolorized তেলে হাইড্রোজেন যোগ করা হয় না ফলে তেলের স্বাভাবিক স্নেহাম্লই বজায় থাকে। বাঙালী গৃহস্থ এই তেল ঘি–এর অনুকল্পরূপে ব্যবহার করতে পারেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় কারখানায় বা মিলে প্রচুর হাইড্রোতেল উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু এই বস্তুটি সম্বন্ধে বিভিন্ন বাদানুবাদ তৈরী হওয়ায় রাজশেখর বসু যুক্তিসিদ্ধ মানসিকতায় বস্তুটিকে দেখেছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণে বোঝার উপযোগী করে তার পুষ্টিগুণ বিচার করেছেন। স্নেহ, স্নেহাম্ল, অপূরিত ও প্রপূরিত এই বিভিন্ন বিষয়গুলি সহজ ভাষায় পরিস্ফুট করে তুলেছেন এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ বাস্তব রাসায়নিক ব্যাপার বোধগম্য হওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন তেল, ঘি–এর যে স্নেহাম্ল থাকে তার অপূরিত ও প্রপূরিত শতকরা ভাগ আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার তুলে ধরেছেন।

তেলের ভাল মন্দের বিচার দেখাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মুখের প্রবাদকে ও তিনি ব্যবহার করেছেন – ''তেল পুড়লে ঘি, ঘি পুড়লে ছাই''[৬৭] এবং সর্বসাধারণের সহজ গ্রাহ্যতার জন্য লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও জুড়ে দিয়েছেন – ''সরষের তেলের দুর্লভতার সময় আমি তিন–চার মাস তিল তেল চালিয়েছিলাম, তার ফলে রান্নাঘরের দেওয়াল তৈলাক্ত হয়ে যায়।''[৬৮]

আধুনিক মানসিকতার প্রক্ষেপ লেখকের মধ্যে দেখা যায় তাই 'খাদ্য' সম্বন্ধে কোন ধরণের বিদ্বেষে তাঁর বিশেষ আপত্তি। তাঁর কথাকে সুদৃঢ় ভিত্তি দেওয়া জন্য উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিম বাঙলার খাদ্য সংকটের কারণ দেখিয়েছেন – রুটিতে আপত্তি এবং অত্যাসক্তি, অভ্যাসে সব ধরণের খাদ্যে মানুষের রুচি হয় তাই অভ্যাস করলে তিল ও চীনাবাদাম তেলে রুচি হবে। বাঙালীর মধ্যে সব প্রদেশের খাদ্যভ্যাস তৈরী হলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা অনেকটা কমে যাবে।

বর্তমানে ভিন্ন প্রদেশের খাদ্য অন্য প্রদেশেও প্রচলিত হয়েছে, সেই বিষয়ের একটি পূর্বাভাস প্রাবন্ধিকের মনোভাবে প্রকাশিত হয়েছে স্নেহদ্রব্যের মত রাসায়নিক একটি বিষয়কে সহজ মনোগ্রাহি ভাষায় প্রাবন্ধিক রসসাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছেন।

## তথ্যসূত্র -


| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | | Compton's pictured Encyclopaedia, Vol-4 | Chicago | 1954 | ৩৯৮ |
| ২) | চট্টোপাধ্যায় কুন্তল | সাহিত্যের রূপ-রীতি অন্যান্য প্রসঙ্গ | রত্নাবলী ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রিট, কলকাতা-৯ | ৭ম নভেম্বর ২০০৯ | ২৯১ |
| ৩) | দে অধীর | আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা ১ম খণ্ড | উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির কলকাতা-৭ | ৩য় মে ২০০৮ | ১২ |
| ৪) | | কথা সাহিত্য (রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা) | | শ্রাবণ ১৩৬০ | ৫৯১ |
| ৫) | বসু রাজশেখর | প্রবন্ধাবলী | মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩ | ৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১ | ৮ |
| ৬) | তদেব | | | | ১১ |

| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭) | তদেব | | | | ১৩ |
| ৮) | তদেব | | | | ১৪ |
| ৯) | তদেব | | | | ১৫ |
| ১০) | তদেব | | | | ১৬ |
| ১১) | মজুমদার উজ্জ্বল কুমার | করতলে নীলকান্তমণি | বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯ | ১ম ১৯৮৮ | ১১১ |
| ১২) | বসু রাজশেখর | প্রবন্ধাবলী | মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩ | ৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১ | ৩৫ |
| ১৩) | তদেব | | | | ৩৬ |
| ১৪) | তদেব | | | | ৪০ |
| ১৫) | তদেব | | | | ৪১ |
| ১৬) | তদেব | | | | ৪১ |

| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭) | তদেব | | | | ৪৪ |
| ১৮) | তদেব | | | | ৪৭ |
| ১৯) | তদেব | | | | ৪৮ |
| ২০) | তদেব | | | | ৪৩ |
| ২১) | তদেব | | | | ৪২ |
| ২২) | তদেব | | | | ১১০ |
| ২৩) | তদেব | | | | ১১১ |
| ২৪) | তদেব | | | | ১৪০ |
| ২৫) | তদেব | | | | ১৪১ |
| ২৬) | তদেব | | | | ১৪২ |
| ২৭) | তদেব | | | | ১৪২ |
| ২৮) | তদেব | | | | ১৪৩ |
| ২৯) | তদেব | | | | ১৪৫ |
| ৩০) | তদেব | | | | ১৪৫ |
| ৩১) | তদেব | | | | ১৪৬ |

| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২) | তদেব | | | | ১৪৬ |
| ৩৩) | তদেব | | | | ১৮০ |
| ৩৪) | তদেব | | | | ১৮০ |
| ৩৫) | তদেব | | | | ১৮১ |
| ৩৬) | তদেব | | | | ১৮২ |
| ৩৭) | তদেব | | | | ১৮২ |
| ৩৮) | তদেব | | | | ১৮৪ |
| ৩৯) | তদেব | | | | ১৮৫ |
| ৪০) | তদেব | | | | ১৭৯ |
| ৪১) | তদেব | | | | ১৮০ |
| ৪২) | তদেব | | | | ১৮১ |
| ৪৩) | তদেব | | | | ১৮০ |
| ৪৪) | তদেব | | | | ১৮১ |
| ৪৫) | তদেব | | | | ১৮৩ |
| ৪৬) | তদেব | | | | ১৮৫ |

| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭) | তদেব | | | | ২২০ |
| ৪৮) | তদেব | | | | ২২০ |
| ৪৯) | তদেব | | | | ২২১ |
| ৫০) | তদেব | | | | ২২১ |
| ৫১) | তদেব | | | | ২২২ |
| ৫২) | তদেব | | | | ২২৩ |
| ৫৩) | তদেব | | | | ২২৫ |
| ৫৪) | তদেব | | | | ২২৬ |
| ৫৫) | তদেব | | | | ২২৬ |
| ৫৬) | মজুমদার উজ্জ্বল কুমার | করতলে নীলকান্তমণি | বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯ | ১ম ১৯৮৮ | ১১৬ |
| ৫৭) | বসু রাজশেখর | প্রবন্ধাবলী | মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা-৭৩ | ৩য় আগষ্ট ২০০৬ | ২৬৭ |

| ক্র.নং | লেখক | গ্রন্থ | প্রকাশক | সংস্করণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৮) | তদেব | | | | ২৬৯ |
| ৫৯) | তদেব | | | | ২৬৭ |
| ৬০) | তদেব | | | | ২৬৭ |
| ৬১) | তদেব | | | | ২৬৯ |
| ৬২) | তদেব | | | | ২৭০ |
| ৬৩) | তদেব | | | | ২৭১ |
| ৬৪) | তদেব | | | | ২৭২ |
| ৬৫) | তদেব | | | | ২৭৪ |
| ৬৬) | তদেব | | | | |
| ৬৭) | তদেব | | | | |